اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০২৫

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

www.ghamidi.org

اشراق
Ishraq USA | Bangla Edition
ইশরাক বাংলা সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ২০২৫

আল-ইশরাক

বাংলা

সূচিপত্র

১) সুরা ফাতিহা ৩

২) নাজমে কুরআন: ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি ৪

৩) হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য: ইমাম আমিন আহসান ১৮

৪) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন একাধিক বিবাহ বিবাহ করেছিলেন? ২৯

৫) প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা কি ইসলামে হারাম? ৩৭

৬) গজল ৪৭

Ghamidi Center of Islamic Learning
www.ghamidi.org
AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

সুরা ফাতিহা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾

اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ
الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ﴿۷﴾

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, যাঁর দয়া চিরন্তন। শোকর আল্লাহর জন্যই, জগতের প্রতিপালক। পরম করুণাময়, যাঁর দয়া চিরন্তন। যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক।

(প্রতিপালক), আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথের হেদায়েত দাও। তাদের পথ, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো, যারা গজবের শিকার হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

নাজমে কুরআন (কুরআনের যোগসূত্র)

ইমাম হামিদুদ্দিন ফারাহি

আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহে এই গ্রন্থে আমি পবিত্র কুরআনের নাজ়ম (সুরা ও আয়াতের পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র) আবিষ্কারের প্রয়াস করেছি।আমার উদ্দেশ্য আল্লাহর দীপ্তিময় কিতাব পবিত্র কুরআনের এমন একটি সহজবোধ্য ও স্পষ্ট তাফসির রচনা করা, যা হবেরাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর মুসলমানদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্ত মতভেদ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। আমি কুরআনের প্রতিটি আয়াত ব্যাখ্যা করার সময় তার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করেছি। এছাড়াও আমি সুরাগুলোর মধ্যে যে ধারাবাহিকতা ও অন্তর্নিহিত সংযোগ রয়েছে, তা অনুধাবনের জন্য প্রসঙ্গানুযায়ী গভীর পাঠ ও বিশ্লেষণ করেছি।এভাবে যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার দিকে পৌঁছেছি, তখনআমিতা যুক্তি ও বাস্তব প্রমাণে দ্বারা উপস্থাপন করেছি। চলুন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা করি।

নাজম

নাজ়ম বা কুরআনের যোগসূত্র উন্মোচনের জন্য আমি কুরআনের বাণীর গভীরে প্রবেশ করেছি।

আল্লাহর বাণীকে ব্যাখ্যা করার এই প্রচেষ্টা আমি নিরবিচারে আল্লাহর কিতাবকেই আঁকড়ে ধরেছি। আমার পথপ্রদর্শক একমাত্র মহান আল্লাহ, যিনি আমাকে এই মহান কিতাবের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র ও বিন্যাস উপলব্ধির জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমি কারো কাছ থেকে ধার করি নাই। এটি কোনো প্রচলিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পন্থা নয়। তবে এটাও আমি বিনয়ীভাবে স্বীকার করি যে, আমিপ্রথম ব্যক্তি নই, যিনি কুরআনের নাজ়ম উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।

অতীতের বহু ইসলামের বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের গবেষণার ফলাফল লিখিত আকারেও উপস্থাপন করেছেন। বহুবিদ্যাশাস্ত্রে পারদর্শী আল্লামা সুয়ূতী তার বিখ্যাত গ্রন্থ আল-ইতক্বান ফী ‘উলূমিল কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

أفرده بالتاليف العلامة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه نظم الدرر في تناسب الآي والسور

আবু হাইয়ানের শিক্ষক, আল্লামা আবু জাফর ইবন যুবায়র, এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছিলেনঃ। যার নাম ‘আল-বুরহান ফী মুনাসাবাতিস-সুয়ারিল কুরআন’(পবিত্র কুরআনের সুরাসমূহের আন্তঃসংযোগ নিয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ), যে গ্রন্থের মধ্যে কুরআনের সুরাগুলোর পরস্পর সংযোগ ও ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের যুগের একজন আলেম, শায়খ বুরহানুদ্দীন বকায়ী, কুরআনের নাজমের বিষয়ে একটি তাফসীর রচনা করেছেন।তাফসীরটির নাম ‘নযমুদ-দুরার ফী তানাসুবিল আয়ি ওয়াস-সুয়ার’ অর্থাৎ আয়াত ও সুরার পরস্পর সামঞ্জস্য সম্পর্কে মুক্তোর মালা বিন্যাসের মতো ব্যাখ্যা।যেখানে তিনি কুরআনের আয়াত ও সুরাসমূহের পারস্পরিক সংগতির উপর গভীর মনোযোগ দিয়েছেন।

আল্লামা সুয়ূতীর আরো একটি একটি গ্রন্থ রয়েছে যেখানে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সুরাসমূহের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য অর্থাৎ নাজম এবং কুরআনের অতিপ্রাকৃত অলৌকিকত্ব ও ভাষাশৈলী সংক্রান্ত অন্যান্য দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

علم المناسبة علم شريف قل إعتناء المفسرين بہ لدقتہ وممن اكثر منہ الإمام فخر الدين فقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط

সুরা ও আয়াতের পারস্পরিক সংযোগ ও অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বোঝার চেষ্টা করা মূলত জ্ঞানের সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় তবেএটিজটিল ও সূক্ষ্ম হওয়ায় মুফাসসিরগণ এ বিষয়ের তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী এই বিদ্যার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেন: “কুরআনের অধিকাংশ সূক্ষ্মতা ও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে এর সুরা ও আয়াতের সুচারু বিন্যাস ও পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে।”

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী সুরা হা-মীমসাজদার ৪৪ নম্বর আয়াত–"وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا" এর ব্যাখায় তাররচিত তাফসীরে লিখেছেন,

نقلوا في سبب النزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا لولا نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية و عندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن لأنہ يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض و أنہ يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع إلتزام مثل هذا الطعن إدعاء كونہ كتابا منظما فضلا عن إدعاء كونہ معجزا بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى أخرها كلام واحد

আলেমগণ মনে করেন করেছেন, এই আয়াতটি সেই সময় নাজিল হয়েছিল, যখনকুরাইশ গোত্রের লোকেরা অভিযোগ করে বলেছিল: “কুরআন কোনো অনারব ভাষায় কেন অবতীর্ণ হলো না?” ইমাম রাযী বলেন, আমিমনেকরি, এ ধরনের ধারণা পবিত্র কুরআনের মর্যাদাকে মারাত্মক প্রশ্নের সম্মুখীন করে।এর অর্থ দাঁড়ায়, কুরআনের আয়াতসমূহ বিচ্ছিন্ন, যেগুলোর মধ্যে কোনো সুসংবদ্ধ যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক নেই।

বরং এর ফলে আল্লাহর কালামের ওপর এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, যা মেনে নিলে কুরআনের পূর্ণাঙ্গতা ও ধারাবাহিকতাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়—এমনকি তা আর অলৌকিক বা অপারাজেয় কালাম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তবে আমি বিশ্বাস করি, এই সুরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ও সংবদ্ধ বক্তব্যের রূপে রচিত।
সুরার মূল বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপন করার পর ইমাম রাযী বলেন,

كل من أنصف و لم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا منتظما مسوقا نحو غرض واحد فيكون هذا التفسير أولى مما ذكروه

প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন, যদিএই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাদের পদ্ধতিতে করা হয়, তবেস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সম্পূর্ণ সুরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল, সংবদ্ধ ও নিরবিচ্ছিন্ন বক্তব্য; যা একটি একক মূল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এমন ব্যাখ্যা অবশ্যই সেইসব সাধারণত প্রচলিত ব্যাখ্যার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, যেগুলোতে এই ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য অনুপস্থিত।

এ পর্যন্ত আমরা পবিত্র কুরআনের নাজমের পক্ষে যারা আলোচনা করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি। তবে এমন অনেক আলেমও ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন কুরআনে কোনো ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্র নেই। যেমন শায়খ ‘ইজ্জুদ্দীন আস্-সালাম বলেন,

فأن القرآن نزل في نيف و عشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة و ما كان كذالک لا يتأتى ربط بعضه ببعض

(পবিত্র কুরআন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, ভিন্ন ভিন্ন হুকুম ও নির্দেশনাসহ দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে।} এভাবে যে কিতাব অবতীর্ণ হয়, তারবিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বা সংগতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়।
আমরা দেখেছি, কুরআনের নাজম সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ বিদ্যমান এবং উভয় মতেরই যথার্থ সমর্থক রয়েছে।আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথম মতের পক্ষপাতী।
উল্লেখিত তথ্যসমূহের আলোকে আমি দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে তুলে ধরতে চাই।

নাজমে কুরআন (কুরআনের যোগসূত্র)

প্রথমত, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ কুরআনের নাজমকে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করেননি। বরং কেউ কেউ এই বিষয়টিকে মনোযোগ দিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনের নাজম কুরআন ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দেখানো করা একটি কঠিন কাজ, যে কাজএখনপর্যন্ত খুবই স্বল্প পরিসরে করা হয়েছে।এটি এক বিরাট ধনরাশি, যারমাত্র অল্পাংশই আজ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

মহান আল্লাহর রহমতে আমি প্রথমে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারা এবং সুরা কাসাসের যোগসূত্র আবিষ্কার করেছি। কুরআনের নিজস্ব বাণী আমাকে এই আবিষ্কারের পথে পরিচালিত করেছে, আমিকোনো বাইরের উৎসের সাহায্যে এই অনুসন্ধান করিনি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার সবথেকে প্রিয় গুনগ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠ করা সবসময় আমার অন্তরাত্মার প্রশান্তির একমাত্র মাধ্যম। বহুবার আমি সেই প্রসিদ্ধ বক্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি, অর্থাৎ কুরআন টুকরো টুকরো আকার অবতীর্ণ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত বাণী।তবে দুইটি দীর্ঘ সুরার যোগসূত্র আবিষ্কার করার পর আমি এই বিষয়ে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ি। মূলত এটিই আমার জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা যখন আমি ছাত্র ছিলাম। আমার একাডেমিক পড়াশোনার কারণে তখন আমি নিজের সমস্ত সময় কুরআনকে উৎসর্গ করতে পারিনি। কিন্তু প্রায় দশ বছর পর আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে আমি পবিত্র কুরআনের যোগসূত্র নিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করতে পারি।প্রথমে আমি এটি নিয়ে প্রায় এক বছর নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করেছি। এরপর আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তারপর, এই অনুসন্ধানের ফলাফল একাডেমিক মহলে উপস্থাপনের চিন্তা আমার মনে উদয় হয়।তবে আমি এই কাজের গুরুত্ব ও এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিবেচনা করে সেই পথে এগোতে আগ্রহী হইনি। তাই দীর্ঘদিন ধরে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের বাণীকে পুনরায় পরীক্ষা করতে শুরু করি।এই সময় আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমাকে অজ্ঞতা ও অন্তর্জগতের প্রলোভন থেকে রক্ষা করেন। সত্য আমার সামনে বহুদিন ধরে স্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল।আর এটা উচিত ছিল যে আমি তাড়াতাড়ি এই সত্য প্রকাশ করে দেবো। তবুও আমি সবসময় এই পৃথিবী থেকে নিরাপদে বিদায় নিতে চেয়েছিলাম, যেনএই মহান আবিষ্কারের দায়বদ্ধতা আমার কাঁধে না আসে।

আমি নিজেকে সেই সকল সৎ বা অসৎ ফলাফলের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম, যা আমার গবেষণার মাধ্যমে সৃষ্ট হতে পারে।তবে বেশ কিছু কারণে আমি বাধ্য হলাম এই সত্য প্রকাশ করে দিতে।তখন আমি আমার দ্বিধাবিভক্ত মনকে পাশ কাটিয়ে এই বিশাল দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে নিলাম।যদিও আমি এর জন্য অনিচ্ছুক ছিলাম।

আমি এ বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি যে, কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে যে মতপার্থক গুলো সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান কারণ হলো নাজম বা কুরআনের যোগসূত্রের প্রতি যথাযথ মনোযোগ না দেওয়া।তারা যদি নাজম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতেন এবং সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হতেন, তবেসকলবিভেদ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যেত।

সকলেই মিলিত হতো একটি সাধারণ পতাকা তলে।একক শব্দকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতেন যেন একটি সুসজ্জিত বৃক্ষ, যারমূলোৎপাটন দৃঢ়, শাখাগুলো আকাশ ছুঁয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই মতপার্থক্য রোধ করা সম্ভব হয়নি, যদিও আল্লাহ তাঁর বাণী আমাদের কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন।

তিনি বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আর সব মিলিয়ে আল্লাহর রশিতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, এবংঐক্যবদ্ধ থেকো; বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।(সুরা আল-ইমরান: ১০৩)

মানুষ আল্লাহর এই রশিকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।প্রতিটি ফিরকা এক একটি পূর্বধারণার চশমা চোখে দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছে।ফলে তারা কুরআনের মূল পাঠ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।অথচ কুরআন বোঝার জন্য নাজম একমাত্র সত্য ও সঠিক পথ, যারপ্রতি কারো মনোযোগ নেই। এই কাঠামো একমাত্র ঢাল, যা বিদআতীদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে পারে, কপটও বক্রচিন্তাধারী লোকদের আক্রমণ থেকে কুরআনকে নিরাপদ রাখতে পারে।

ধর্ম বিদ্বেষীরা প্রতিনিয়ত পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তির তীর ছুঁড়ে চলছে। তাদের অভিযোগ হলো, পবিত্র কুরআন একটি অগোছালো গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থে কোনো প্রকার সুবিন্যস্ত রচনার ছাপ নেই। আল্লাহর এই পবিত্র বাণীকে এমন জঘন্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আপত্তি থেকে মুক্ত করা এবং সত্যকে উন্মোচন করাই ছিল মুসলিম আলেমদের দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম আলেমগণ এই ধর্মবিদ্বেষীদের জবাব দিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু তারা অভিযোগকারীদের কাছে আপোষ ও আত্মসমর্পণ করেছে। এই অবস্থায় আমি নীরব দর্শকের মতো বসে থাকতে পারেনি। আমি স্পষ্টভাবে এটি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, ধর্মবিরোধীদের এই আপত্তিগুলো অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন। আমি দেখতে পেলাম সত্য মিথ্যার নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছে তাই আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও এটি একটি অকাট্য সত্য, প্রত্যেক বক্তব্যের মধ্যে নাজম বা যোগসূত্র থাকবেই। যদি যোগসূত্র না থাকে তাহলে বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ‘তারতাৎপর্য ও গভীর বার্তা’ অস্পষ্ট হয়ে পড়ে।একটি সম্পূর্ণ রচনা কেবল তার অংশসমূহের যোগফল নয়; বরংএতেএমনকিছু অতিরিক্ত তাৎপর্য নিহিত থাকে, যা কেবল সামগ্রিক রূপেই ধরা দেয়।যেমন আঙ্গুর আর তার থেকে তৈরি সরাব–এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি কেউ কোনো বক্তব্যের যোগসূত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারে তাহলে তার কাছে সেই বক্তব্য সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হয়।এ অবস্থায় সে এক প্রকার অন্ধ অবস্থায় থাকে–তেমনই অন্ধ যেমন ছিল আহলে কিতাবীরা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

এরপর যে গ্রন্থটির মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল সেটির একাংশ তারাও ভুলে গিয়েছে। তাই তাদের উভয়ের মাঝে আমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি।(সুরা মায়েদা: ১৪)

আমার আশঙ্কা, মুসলিমদের মধ্যে যে শত্রুতা ও বিরোধের আগুন জ্বলে উঠেছে, তারমূলকারণ আমরা পবিত্র কুরআনের গভীর অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং কুরআনের ধারাবাহিকতা ও সামগ্রিক যোগসূত্র উপেক্ষা করেছি। আল্লাহ না করুন, এই অকল্যাণ সহজে বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহর বাণীর অর্থ নিয়ে মতবিরোধের অবশ্যম্ভাব্য ফল হলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিভাজন।

ফলে আমরা ঠিক সেই পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছি, যা আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাদের সামনে তখনো আশার দ্বার খোলা ছিল, কেননা তাদের সামনে ছিল শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবংচূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ওহি। কিন্তু আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই– তাইআমাদের ফিরতেই হবে কুরআনের দিকেই। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক দুর্বলতা রয়েছে–তা কুরআন স্বীকার করে নিয়ে তার আলোকে বিধানকে ধাপে ধাপে প্রয়োগ করেছে। এ ধরনের দুর্বলতা মানুষের স্বভাবগত–এই সত্যটি নিম্নোক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে,

(কারণ যে দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে পাঠানো হয়েছে তা একটি ভারি দায়িত্ব)। এর আগে আমি আদমের উপর একটি অঙ্গীকার পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন এবং আমি তার মধ্যে ইচ্ছার দৃঢ়তা পাইনি। (সুরা ত্ব-হা: ১১৫)

মানুষের দুর্বলতাকে বিবেচনা করে যে সহজতর আয়াত নাজিল করা হয়েছে, তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও আমরা সহজেই বুঝতে পারি:

এখন অবশ্য তিনি তোমাদের বোঝা কমিয়ে দিয়েছেন; কারণ তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা এসে গিয়েছে।(সুরা আনফাল: ৬৬)

এই আয়াতটি সরাসরি তার আগের আয়াতের আদেশের পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছিল, হে নবী, আপনি এই মুমিনদেরকে (ওই) যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন (যারনির্দেশ পূর্বে দেয়া হয়েছে)।

অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে পূর্বের আদেশকে বাতিল করা হয়েছে।অনুরূপভাবে, সুরা মুজ্জম্মিলের প্রথম আয়াত ও শেষ আয়াতের নাযিল হওয়ার সময় কালের মধ্যে অনেক বছর পার্থক্য রয়েছে। প্রথম আয়াতগুলোতে মুসলিমদের রাত্রি জাগরণের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর শেষআয়াতটি সেই আদেশ বাতিল করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে উভয় আদেশের অবতরণের সময়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বাতিলকারী আয়াতটি বাতিলকৃত আদেশের পরেই রাখা হয়েছে।রমজান মাসের রাতগুলোতে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতির আয়াতের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।

এছাড়াও যেসব আয়াতে স্ত্রীদের জন্য উইল বা বিবাহিত সম্পত্তির বিধান রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই বিষয়টি প্রমাণ করতে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।আমি সুরার ব্যাখ্যায় আলোচনা করেছি, শেষের এই আয়াতটি পুরো অধ্যায়কে পরিপূর্ণ করে এমন আয়াতগুলোর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে।বাস্তবে এই আয়াতটি সেই প্রথম পরিপূরক আয়াতের পর খুব সূক্ষ্মভাবে রাখা হয়েছে। এধরনের ব্যাখ্যামূলক আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রায়শই বলা হয়,

এভাবেই আল্লাহ মানুষদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট ও স্পষ্ট করে দেন। (সুরা বাকারা: ১৮৭)

আমার মতে এই বেক্ষামূলক আয়াত নাযিল হওয়ার মূল কারণ হলো আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুতি যা সুরা কিয়ামায় উল্লেখ করা হয়েছে,

এরপর [প্রয়োজন হলে] এটির ব্যাখ্যা করাও আমারই দায়িত্ব।(সুরা কিয়ামা: ১৯)

আর এটি সেই প্রার্থনার প্রতিফল যা আল্লাহ নিজেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শিখিয়েছিলেন।এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

অতএব প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ সুমহান। (তিনি তার প্রজ্ঞা অনুসারে এই কুরআন এভাবেই ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করবেন, এই বিষয়টি আপনি জেনে রাখুন) আর এই কুরআন আপনার কাছে ওহি করার কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই এটিকে পেতে আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না এবং প্রার্থনা করতে থাকুন: ওগোআমার প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন।(সুরা ত্ব-হা: ১১৪)

হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হতো ঠিক তখনই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেইআয়াতকে নির্দিষ্ট একটি সুরার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন।নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরাসরি নির্দেশে কুরআনের সেই অংশ যথাযথ স্থানে সংরক্ষিত হতো।

হাদিসের একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কখনো কখনো একটি সুরা সম্পূর্ণ হওয়ার পর ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে পুরো সুরাটি পাঠ করতেন। আমার মতামত অনুযায়ী, এটিসুরা কিয়ামার উল্লেখিত ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি–‘জম‘ (সংকলন) এবং ‘কুরআন’ (পাঠ)-এর পূর্ণতা–সাধনেরও একটি বাস্তব রূপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই বিধান ও পাঠ অনুসরণের জন্যই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের সুরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সম্পূর্ণ উম্মাহর দ্বারা স্বীকৃত। ইসলামের সকল ফেরকা ও মতবাদ– নিজেদের মধ্যে যতই বিভাজনে লিপ্ত থাকুক না কেন– তারা সবাই একই পাঠ, একইআয়াতক্রম এবং একই সুরাবিন্যাস অনুসরণ করে।

আরেকটি বিষয় যা কুরআনের নাজম সম্পর্কিত আমার এই মতামতকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, তা হলো, সেইমানুষদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাদের অন্তর আল্লা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যারফলেতারা কুরআনের সূক্ষ্ম বিন্যাস ও গঠন উপলব্ধি করতে পেরেছে।এই বিদ্বানগণ আল্লাহর কিতাবের সূক্ষ্ম রচনাবিন্যাসের মাঝে নিহিত কিছু বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের মতামত হলো–আল্লাহর এই কিতাব এক অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার, এটিএকটি বিস্ময়কর কুদর, যারগভীরত্বে প্রবেশ করার জন্য তার গঠনতত্ত্ব ও বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে হয়।আর এটি করতে পারলি একজন পাঠক কুরানের গভীরে প্রবেশ করতে পারবে। কুরআনের গভীরে পৌঁছানোর জন্য তারা দিন দিন আরও উৎসাহিত হবে।

ফলে আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাকে সফল করবেন পাঠক কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহ্ তাদের সামনে জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।আল্লাহর কিতাব এক অগাধ জ্ঞানের মহাসাগর, যারবিস্ময় ও রত্নভান্ডার কখনো শেষ হবে না। সূর্যের আলোকে কেউ কি কখনো পুরোপুরি ধারণ করতে পেরেছে? কুরআনের সকল জ্ঞান কি কেউ কখনো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছে? ভুলথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন দাবিই বা কে করতে পারে?

কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা একজন জ্ঞান অনুরাগী শিক্ষার্থীর কুরআন পাঠের উৎসাহ ও জ্ঞানপিপাসাকে বিন্দুমাত্র দমন করতে পারে না। বরং তারা কৃতজ্ঞতাভরে নিজেদের অর্জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং সদা অনুসন্ধানী চিত্তে জ্ঞানের এই অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান চালিয়ে যায়। আপনি কি দেখেন না, যারা এই জ্ঞানের কোনো অংশ লাভ করেছেন, তাঁরা সর্বদা আল্লাহর এই অতুলনীয় অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন?

ইমাম সূউতী (রহ.) বলেছেন,

أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبوبكر النيشابورى و كان غزير في الشريعة والأدب و كان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه و ما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة و كان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সুরার পারস্পরিক সংযোগ ও সামঞ্জস্য অধ্যয়নের গুরুত্বের যিনি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন, তিনি হলেন শায়খ আবু বকর নিশাপুরী। তিনি ছিলেন ইসলামী আইনশাস্ত্র ও সাহিত্যজ্ঞানের এক বিশিষ্ট মনীষী। তিনি শিক্ষকের আসনে বসে তার সামনে পাঠ করা কুরআনের আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করতেন এবং ব্যাখ্যার সময় বিশেষ কোনো আয়াত কেন একটি নির্দিষ্ট আয়াতের পরে এসেছে, কিংবা একটি সুরার পর আরেকটি সুরা কেন রাখা হয়েছে—তা ব্যাখ্যা করে এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও হিকমতের দিকগুলো তুলে ধরতেন। তিনি প্রায়ই বাগদাদের বিদ্বানদের সমালোচনা করতেন এই বলে যে, তারা কুরআনের আয়াত ও সুরার পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্কিত জ্ঞানে দুর্বল ও উদাসীন।

ইমাম সূউতী (রহ.) ইবনে আরাবীর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

إرتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله لنا فيه فلم نجد له حملته و رأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه و جعلناه بيننا و بين الله و رددناه إليه

কুরআনের আয়াতগুলো এমনভাবে সংযুক্ত করে উপস্থাপন করা যে, সম্পূর্ণ পাঠ্য একটি সুচিন্তিত, সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ রচনারূপে প্রতিভাত হয়—নিঃসন্দেহে এটি একটি মহান জ্ঞানের শাখা। এখন পর্যন্ত কেবল একজনই আছেন যিনি এই বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে সুরা বাকারাকে একটি সম্পূর্ণ, সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আলোচনারূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হন।

এরপর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ ও দয়ার মাধ্যমে আমার জন্য এই জ্ঞানের দ্বার খুলে দেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম–মানুষ এই জ্ঞানের মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করে না।আমি দেখলাম, লোকদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নয়, অন্তর্দৃষ্টি দুর্বল। এই অবস্থায় আমাকে বাধ্য হয়ে এই দরজাকে আবার বন্ধ করে রাখতে হয় এবং এই বিষয়টিকে আল্লাহর সঙ্গে আমার মধ্যকার এক নিভৃত ব্যাপার হিসেবেই রেখে দিই।

এই মহান জ্ঞানের জন্য ইমাম রাযিও তার তাফসিরে বারবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। মখদুম মহাআইমী (রহ.)-এর কুরআন ব্যাখ্যামূলক রচনাটিও প্রধানত আয়াতসমূহের আন্তঃসম্পর্ক বা পরস্পরের সংগতি ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এর জন্য তিনি গভীরভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তার নিজের অক্ষমতাও আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি এই জ্ঞানকে একান্তই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বলে মনে করেছেন এবং নিজের অবদান বা যোগ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।আমি মনে করি, এমনগভীর কৃতজ্ঞতা ও বিনয়বোধ থেকেই তিনি তার তাফসিরের নাম রেখেছেন–"তাবসীরুর রাহমান ও তাসীরুল মান্নান" (রহমানের প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি এবং দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজীকরণ)।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যারা কুরআনের আয়াতসমূহের যোগসূত্র ও গঠনগত সৌন্দর্যের জ্ঞান লাভ করেছেন, তারা এই জ্ঞানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতেন। তাদের এই স্বীকারোক্তি হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। কারণ তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কুরআনের আয়াতসমূহ এক অত্যাশ্চর্য বিন্যাসে গঠিত। এ বিষয়ে শায়খ ওয়ালিউদ্দিন মালাওয়ী বলেছেন,

قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة و فصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا و على حسب الحكمة ترتيبا

যারা বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ খোঁজার প্রয়াস অনুচিত। কারণ এসব আয়াত নাজিল হয়েছে বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, তারা একেবারেই ভুল করছেন।

প্রকৃত সত্য হলো, যদিও আয়াতগুলো বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও অবস্থায় নাজিল হয়েছে, তবুও আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমতের আলোকে সেগুলোকে কুরআনের বর্তমান বিন্যাসে এমনভাবে সাজানো হয়েছে—যাতে একটি সুবিন্যস্ত, সংগঠিত ও গভীর তাৎপর্যময় রচনা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

পবিত্র কুরআনের সূক্ষ্ম বিন্যাসের সুগন্ধ অনুভব করা, তারসৌন্দর্যকে চোখে দেখা এবং মন দিয়ে অনুভব করার এই সত্য বিজ্ঞ পাঠক অস্বীকার করতে পারে না। তবে যারা মনে করেন কুরআন গোছানো গ্রন্থ নয়, শুধুমাত্র এ কারণে তাদের দোষ দেওয়া যায় না যে, তারা এখনও কুরআনের নাজম উপলব্ধি করতে পারেনি। আমি যা আলেমদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই, তারজন্য এত বিশদ ও দীর্ঘ আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল না। তবুও কুরআনের যোগসূত্র আবিষ্কার করার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা জরুরি হওয়ায় আমি এই আলোচনা এতদূর লম্বা করেছি।যদি কেউ মনে করেন এই কিতাবে কোনো নাজরে আলোচনা নেই।তবে তার পক্ষে এই পথচলায় এক পা এগোনোও সম্ভব হবে না। সবকিছু তার কাছে এত অচেনা ও অজানা মনে হবে যে, সে কখনোই গভীরভাবে নিজেকে নিবেদন করতে পারবে না।

তবে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, যদিকুরআনের নাজম এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে কেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ (রা.) এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন? কেননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এই গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরিক বিষয় সম্পর্কে মুসলিমদের বলেননি?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো তারা সকলেই পবিত্র কুরআনের আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

কুরআনের বাণী তাদের জীবনের সমস্যা ও পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে নাজিল হয়েছিল। যদি আমরা সেই পবিত্র যুগে জীবনযাপন করতাম, তবেকুরআনের যোগসূত্র আমাদের কাছেও স্বচ্ছ হয়ে উঠত। এজন্যই আমরা দেখি যে, সাহাবাগণের কাছে তুলনামূলক কমই তাফসীরমূলক বর্ণনা সংরক্ষিত আছে; কারণ কুরআন তাদের মাতৃভাষায় নাযিল হয়েছিল, তাদের ভাষার শৈলী অনুসরণ করেছিল এবং তাদের সমস্যা ও প্রশ্নগুলোই কুরআনে আলোচিত হয়েছিল। সুতরাং তাহলে কুরআনের যোগসূত্র বোঝার ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা তাদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে পারি? তবুসাহাবাগণ (রহ.) ও আমাদের মধ্যে কালক্ষেপণের এত বড় ফারাক থাকা সত্ত্বেও, কুরআনের পাঠ্যাংশে, আয়াতের পুনরাবৃত্তি, ভাষণের দৃঢ়তা এবং যুক্তি উপস্থাপনার মধ্যে কিছু নিদর্শন রয়েছে যা আমাদের অনুপস্থিতি ছাড়িয়ে এক গভীর বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে। এই বিষয়গুলো অবিরত আলোকিত করে এবং প্রতিটি উৎসাহী ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠককে নাজম উপলব্ধি করতে সহায়তা করে।

এখানে আমি নাজম সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করছি।

হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য

ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি

হাদিস ও সুন্নাহকে সাধারণত সমার্থক পরিভাষা মনে করা হয়।তবে এই ধারণা সঠিক নয়, কারণ হাদিস ও সুন্নাহর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এবং ইসলামে হাদিস ও সুন্নাহর পৃথক মর্যাদা ও অবস্থান রয়েছে। হাদিস ও সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য সবার আগে এই দুটি পরিভাষার পার্থক্য বুঝতে হবে।

হাদিস:

হাদিস শব্দটি দ্বারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি, কর্ম বা মৌন সম্মতিকে বোঝানো হয়, যা সত্য বা মিথ্যা উভয় সূত্রেই বর্ণিত হতে পারে।হাদিসশাস্ত্রের সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ, যারা 'মুহাদ্দিস' নামে পরিচিত, মৌনসম্মতির ক্ষেত্রে 'তাকরির' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে কোনো মুসলিম এমন কোনো কাজ করেছেন, যা তিনি লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু আপত্তি বা নিন্দা করেননি।মুহাদ্দিসগণ হাদিসের জন্য 'খবর' নামক আরেকটি পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন।হাদিসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, একটি 'খবর' সত্য কিংবা বানোয়াট কাহিনী উভয়ই হতে পারে।তাই মুসলিম আলেমগণ মনে করেন হাদিস মূলত 'যন্নী' বা সম্ভাব্যরূপে সত্য।

এ কারণেই নির্ভরযোগ্যতার বিচারে হাদিসের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন: সহীহ, হাসান, যঈফ, মওযূ, মাকলূব ইত্যাদি।হাদিসের এই প্রতিটি বিভাগকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে বিবেচনা করা হয় এবং এগুলোর গুরুত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

খবরের প্রকারভেদ:

মুহাদ্দিসগণ হাদিস বা খবরকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন:
১. খবরে মুতাওয়াতির
২. খবরে ওয়াহিদ

১. খবরে মুতাওয়াতির:

আল-কিফায়াহ ফী ইলম আল-রিওয়ায়াহ’ গ্রন্থের লেখক, খতীব আল-বাগদাদী, ‘মুতাওয়াতির’ বর্ণনার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন: মুতাওয়াতির হাদিস হলো বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয় হাদিস, যাকে বানোয়াট বর্ণনা হিসেবে প্রচার করা সম্ভব নয়।হাদিসশাস্ত্রে ‘খবরে মুতাওয়াতির’ শব্দটি প্রচলিত হলেও, এর দ্বারা যা বোঝানো হয়, তারবাস্তব অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। অনেক সময় একটি হাদিসকে ‘খবরে মশহুর’ বলেগণ্য করা হয়। কিন্তু গবেষণা করলে দেখা যায় যে, এর সনদবা বর্ণনাসূত্রের প্রথম তিন স্তরের প্রত্যেকটিতে কেবল একজন বর্ণনাকারীই রয়েছেন। এ ধরনের বর্ণনাগুলো তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরে পৌঁছানোর পরেই বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হতে দেখা যায়। তাই আমি মনে করি যে হাদিসগুলোকে ‘খবরে মুতাওয়াতির’ হিসেবে গণ্য করা হয় তা যথার্থভাবে যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার পর যদি কোনো হাদিস ‘খবরে মুতাওয়াতির’ হাওয়ার যোগ্যতা রাখে তবেই তাকে ‘খবরে মুতাওয়াতির’ বলাযেতে পারে, এছাড়া কোনো হাদিসকে ‘খবরে মুতাওয়াতির’ বলাযাবে না।উল্লেখ্য যে, আমার মতে কেবল সুন্নাহ-ই হলোমুতাওয়াতির। সুন্নাহর মুতাওয়াতির হওয়া হাদিসের মতো মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়। সুন্নাহ হলো সেই মুতাওয়াতির আমল যা মুসলিমদের প্রতিটি প্রজন্ম নিজেদের কর্মের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্নভাবে পালন করে এসেছে।

২. খবরে ওয়াহিদ

খবরে ওয়াহিদ বলতে সেই হাদিসকে বোঝায় যে হাদিস নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না। যদিও একাধিক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তবু তা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না।হাদিস সাহিত্যের বেশিরভাগই খবরে ওয়াহিদ খবরে ওয়াহিদ বা একক বিচ্ছিন্ন বর্ণনা।

প্রামাণ্যতা অনুসারে হাদিসের শ্রেণীবিভাগ

ইমাম খতীব বাগদাদী প্রামাণ্যতা অনুসারে হাদিসকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।
১. খাঁটি বা গ্রহণযোগ্য হাদিস
২. বানোয়াট হাদিস
৩. অস্পষ্ট হাদিস

নিচে এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

১. খাঁটি বা গ্রহণযোগ্য হাদিস
ইমাম খতীব বাগদাদীর মতে এই হাদিস প্রথম শ্রেণীর হাদিসের অন্তর্ভুক্ত।কেননা এই হাদিসগুলো মানুষের বিবেক বুদ্ধি এবং সাধারন জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।এছাড়ও এই হাদিসের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এই হাদিসগুলোকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।উল্লেখ্য যে, এখানে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা ধর্মীয় বিদআত এবং অন্ধ অনুকরণের দূষণ থেকে পবিত্র।

হযরত সাওবান (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন:
আমার উম্মাহর একটি দল সর্বদা সত্যের উপর অবিচল থাকবে। কিছু লোক তাদের পরিত্যাগ করলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তারা এই (অবিচল) অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশ আসে।(মুসলিম শরিফ)

২. বানোয়াট হাদিস

ইমাম খতীব বাগদাদীর মতে যে হাদিস বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক সেই হাদিসই বানোয়াট হাদিস।খবরে ওয়াহিদ বর্ণিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থ, তাইসেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।এ কারণেই হানাফী ফকীহদের মতে, ‘উমুমুল বালওয়া’-এর ক্ষেত্রে একক বর্ণনাগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। এই ধরনের বিষয়ে তারা কিয়াস এবং ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৩. অস্পষ্ট হাদিস

যে হাদিসগুলো পরস্পর বিরোধী বর্ণনা প্রদান করে সেগুলোকে অস্পষ্ট হাদিস বলা হয়। এ ধরনের হাদিসের ক্ষেত্রে কেবল সেই হাদিসকেই গ্রহণ করা উচিত যেই হাদিসের পাঠ্য কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

সুন্নাহ

আভিধানিকভাবে সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো সুস্পষ্ট, বহুল ব্যবহৃত, ব্যস্ত এবং সমতল রাস্তা।কুরআনে সুন্নাহ শব্দটি আল্লাহ বিভিন্ন জাতির সাথে তাঁরকৃত আচরণ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন,

পূর্বে যে নবীগণ গত হয়েছেন তাদের বেলায়ও আল্লাহর একই নীতি ছিল।আল্লাহর আদেশ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।(সুরা আহযাব: ৩৮)

অতএব এখন তারা শুধু আল্লাহর সেই চিরন্তন নীতি প্রকাশিত হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে যা পূর্ববর্তীদের বেলায় প্রকাশিত হয়েছিল।(তা-ই যদি হয়) তাহলে আল্লাহর এই চিরন্তন নীতির মধ্যে আপনি কখনোই কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন না এবং আল্লাহর এই চিরন্তন নীতির ব্যত্যয় ঘটতেও আপনি কখনো দেখবেন না।(সুরা ফাতির: ৪৩)

মূলত সুন্নাহ হলো সেই আমল যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীয়তের শিক্ষক এবং সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে শিক্ষা দিয়েছেন এবং কার্যত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এই সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল।

কুরআনে বলা হয়েছে,

বাস্তবতা হচ্ছে, আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধি করেন এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাদেরকে বিধান ও হিকমত শিক্ষা দেন।আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।(সুরা আল ইমরান: ১৬৪)

(হে মানুষেরা, সে সময়) আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য (অটলতা ও অবিচলতার) এক উত্তম নজির ছিল; যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অনেক বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য।(সুরা আহযাব: ২১)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।তিনি আমাদের কেবল ধর্মীয় নির্দেশা এবং শিষ্টাচার শেখাননি, বরংকীভাবে সেগুলো অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হয় তারও ব্যবহারিকভাবে দেখিয়েছেন।সুন্নাহ অস্বীকারকরী মনে করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সাধারণ বার্তাবাহক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কেবল আল্লাহর কিতাব বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি, বরংমানুষকে পরিশুদ্ধ করতে এবং শরীয়ত কীভাবে অনুশীলন করতে হয় তা শেখানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল।তিনি মুমিনদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তি।কেবল তাকে অনুসরণ করেই আমরা আমাদের জীবনকে ইসলাম এবং ঈমানের নির্দেশাবলী অনুসারে গঠন করতে পারি।

সুন্নাহর গুরুত্ব

কুরআনের বিধানগুলো নির্দেশ আকারে দেয়া হয়েছে, এই বিধান কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তা বলা হয়নি। এর আমল বা প্রয়োগ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাখ্যার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের সমগ্র কাঠামো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর ভিত্তির উপর নির্মিত। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন কেবল নামায, রোযা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে, এই নির্দেশাবলী কিতাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তা বলা হয়নি। এমনকি নামাযের সময় এবং রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণও আমরা কুরআনে নেই। অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। যেমন একজন দোষী সাব্যস্ত চোরের হাত কাটার নির্দেশ কুরআনে পাওয়া যায়। কিন্তু কুরআনে এ কথা বলা হয়নি চুরি করা বস্তুর কতটুকু মূল্য হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে, হাতকোথা থেকে কাটা হবে। এই ধরনের প্রশ্নগুলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখনিঃসৃত বাণী এবং তাঁর অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি আমরা সুন্নাহকে একপাশে সরিয়ে রাখি, তবেআমাদের কাছে কেবল কুরআনের মূল নির্দেশনাগুলোই থাকবে এবং আমরা সেগুলো কীভাবে অনুশীলন করতে হবে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাব,যেমনটি ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারী, তথাকথিত 'হানিফদের সাথে ঘটেছিল। কথিত আছে যে, তারা কাবার দেয়ালের পাশে বসে আল্লাহকে বলত: "হে প্রভু, আমরা জানি না কীভাবে আপনার ইবাদত করতে হয়। যদি আমরা জানতাম, তবেআমরা নির্ধারিত উপায়ে আপনার ইবাদত করতাম। কুরআনের এই বিধানগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা কেবল সুন্নাতের মাধ্যমে করা সম্ভব এবং সুন্নাতের মাধ্যমেই কুরআনের এই বিধানগুলো পূর্ণাঙ্গতা পায়।

ঠিক এই কারণেই নবী (সাঃ) বলেছেন,

সাবধান, আমাকে কুরআন এবং এর সাথে এর মতো আরও কিছু দেওয়া হয়েছে। (আবুদাউদ, নং: ৪৬০৪)

অর্থাৎ কুরআনের মতোই সুন্নাহও আমাদের অপরিহার্যভাবে মেনে চলতে হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কুরআনকে স্পষ্ট করার জন্য নবী (সা)-কে পাঠিয়েছেন। তিনি কুরআনের শিক্ষার সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপনকারী এক অনুকরণীয় উদাহরণ। তিনি এই কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন।

সুতরাং কুরআনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক। কুরআনের শিক্ষা হলো আত্মা, যারপর্যবেক্ষণযোগ্য রূপ হলো সুন্নাহ। উভয় মিলেই ইসলাম গঠিত। এর কোনো একটির অনুপস্থিতি ইসলামকে বিকৃত করে দিবে এবং ইসলামের কাঠামোকে ধসিয়ে দিবে।

কুরআন ও সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্ক

কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।এই সম্পর্কের গভীরতা এতটাই বিস্তৃত যে, সামান্য আলোচনায় তা শেষ করা যাবে না। কুরআন ও সুন্নাহর সম্পর্ক রেকর্ড করতে গেলে পুরো একটি লাইব্রেরি প্রয়োজন। যাইহোক, যেহেতু সুন্নাহ মৌখিক বা গ্রন্থগত কোনো বিদ্যা নয়, তাইনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের আমল ব্যবহারিকভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর, এই দায়িত্ব তাঁর সাহাবীদের (রা.) উপরএসেপড়েছিল। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহর ধার্মিক ও পরহেজগার ব্যক্তিরা, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী, এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাকওয়া সম্পন্ন এবং যারা আল্লাহর ধর্মের জন্য কাজ করতে এগিয়ে আসে, তাদের উপর জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজেরা সতর্কতার সাথে সুন্নাহ পালন করবেন, এমনকি সেইসব বিষয়ও যা আপাতদৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সাধারণ মানুষকে সেগুলো মেনে চলার শিক্ষা দিবেন।

সুন্নাহর প্রকৃতি এবং পরিধি

সুন্নাহ কেবল মানব জীবনের ব্যবহারিক দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত।এটি কেবল ধর্মীয় অনুশীলনগুলোর সাথে সম্পর্কিত।মুসলিমদের বিশ্বাস, ইতিহাস এবং কুরআনের আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক নেই।

সুন্নাহ হাদিসের উপর নির্ভরশীল নয়

সুন্নাহ হাদিসের উপর নির্ভরশীল নয়।হাদিস মূলত সত্য বা মিথ্যা উভয় সূত্রেই বর্ণিত হতে পারে কিন্তু সুন্নাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।নবী (সা) থেকে আমাদের পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম প্রজন্ম কোনো বিরতি ছাড়াই এটি অনুসরণ করেছে।যেভাবে পবিত্র কুরআন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৌখিক বর্ণনার (তাওয়াতুরে কওলী) মাধ্যমে প্রথমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে তাঁর সাহাবীদের (রা.) প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়েছে, যারা এটিকে ঐকমত্যের সাথে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি প্রজন্ম কুরআনের এই অবিচ্ছিন্ন স্থানান্তরের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে যতক্ষণ না এটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ঠিক একইভাবে সুন্নাহও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রতিটি স্তরে ব্যবহারিক আনুগত্যের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।হাদিসের মধ্যে ইবাদতের যে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় তা মূলত সুন্নাহর পক্ষে একটি গ্রন্থগত সমর্থন যোগায়। এ কারণেই সুন্নাতের আমলের সাথে কোনো হাদিস যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন সেই হাদিসকে গ্রহণযোগ্য হাদিস বলা হয় আর যদিসুন্নাতের আমলের সাথে কোনো হাদিস সাংঘর্ষিক হয় তবে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে হাদিসকে অগ্রহণযোগ্য বলার আগে একজন হাদিস বিশারদের অবশ্য কর্তব্য হলো ভালোভাবে সেই হাদিসকে পর্যালোচনা করা এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে হাদিসকে মিলিয়ে দেখার।

এ কারণেই ইমাম মালিক মদিনার অধিবাসীদের ব্যবহারিক আমলকে সর্বদা হাদিসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম মালিক মনে করতেন মদিনার অধিবাসীদের আমলের সত্যতা হাদিসের থেকেও বেশি নির্ভরযোগ্য ইমাম আবু হানিফার অনুসারীরাও এই ভিত্তিতেই হাদিসকে খুব বেশি গুরুত্ব দেননি।

নবী (সাঃ) বলেছেন:
তোমাদের উপর আমার অনুশীলন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুশীলন অনুসরণ করা অপরিহার্য।(ইবনে মাজাহ, নং: ৪২)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীরা (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রাপক এবং ইসলাম অনুশীলনকারী প্রথম ব্যক্তি।তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তা বিশ্বে পৌঁছে দিয়েছেন। একারণেই তাদের অনুশীলন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপরভিত্তি করে গৃহীত এবং স্বীকৃত। বর্তমান সময়ে, যারা ইসলামের নামে নতুন অনুশীলন উদ্ভাবন করে এবং সেগুলোকে ধর্মীয় আচার হিসেবে পালন করে, তারা হলো বিদআতী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের নামে প্রবর্তিত মিথ্যা, বানোয়াট এবং বিদআতকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া পথভ্রষ্টতা হিসেবে নিন্দা করেছেন।

সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের (মুনকিরীনে সুন্নাহ) প্রতি একটি প্রশ্ন

সম্প্রতি একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে, কিন্তু সুন্নাহর কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করে।তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর পেছনের যুক্তি বোধগম্য নয়। কুরআন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মৌখিক বর্ণনা (তাওয়াতুরে কওলী) দ্বারা আমাদের কাছে পৌঁছেছে।একইভাবে সুন্নাহও নবী (সা) থেকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ব্যবহারিক আনুগত্য এবং অবিচ্ছিন্ন অনুশীলনের (তাওয়াতুরে ‘আমালী) মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ একই প্রক্রিয়ায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সুতরাং যারা সুন্নাহ অস্বীকার করে তাদের কাছে কুরআনকে সত্য হিসেবে স্বীকার করার কোনো প্রমাণ বা যুক্তি থাকে না। কারণ ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আমাদের কাছে স্থানান্তরের বাহনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু অধিকাংশ মুসলমান হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারেনা, তাইহাদিসের ভুল বর্ণনা গুলোকে তারা সুন্নাহ মনে করে এবং হাদিসের পাশাপাশি সুন্নাহকেও তারা প্রত্যাখ্যান করে।

সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের জ্ঞানতত্ত্বিক আন্দোলনের ইতিহাস যারা জানেন তারা এ বিষয়ে দ্বিমত করতে পারবেন না যে, সুন্নাহ অস্বীকার করার প্রবণতা মূলত হাদিসের কিছু ভুল ব্যাখ্যার ওপর প্রশ্ন ছুড়ে দেয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে মুসলিম আলেমগণ এই প্রশ্নকারীদের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং এই বিতর্কের মায়াজালে জড়িয়ে হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যকার প্রকৃত পার্থক্য ভুলে যান।হাদিসের উপর আক্রমণকারীরাও উপলব্ধি করতে পারেনি যে তারা হাদিসের সমালোচনা করতে গিয়ে সুন্নাহকে অস্বীকার করছে। একইভাবে হাদিস রক্ষাকারী আলেমরাও হাদিসকে রক্ষা করতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছেন যে হাদিস আর সুন্নাহ এক নয়। উপরন্তু একটি অহেতুক বিতর্কে উভয়পক্ষ নিজেদের সমস্ত শক্তি এবং সময় ব্যয় করেছেন।ফলে একদল ইসলামের মূল ভিত্তিক অস্বীকার করে বসলো এবং অন্য দল সুন্নাতের কাঠামোকে দুর্বল করে তুলল।

একই আমলের বিভিন্ন আদর্শ রূপ

অনেকেই এটি মেনে নিতে চায় না যে ইসলামের একটি আমলের একাধিক বৈধ পদ্ধতি থাকতে পারে।ইসলামের এই আমলগত বৈচিত্র অনুধাবন করতে না পারার কারণেই মুসলিমরা আজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।ফলে একে অপরকে ভ্রান্ত ও বধভ্রষ্ট মনে করছে। এক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কটিবিষয়ে বিভিন্ন সুন্নাহ প্রবর্তন করতে পারতেন।

একটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, বিদায় হজের সময় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি আসনে বসেছিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করেছিলেন।লোকেরা তাঁর কাছে এসে হজের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা চেয়েছিল।একজন বলল, অমুক ব্যক্তি নির্দিষ্ট হজের আমলকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সম্পাদন করেছে।নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, এতে কোনো ভুল বা সমস্যা নেই। আরেকজন ব্যক্তি সেই একই অনুষ্ঠান সম্পাদনের তার পদ্ধতির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তারপদ্ধতিও সঠিক এবং বৈধ।সে কোনো পাপ করেনি।লোকেরা তাঁর কাছে ভিড় করে আসতে থাকে এবং নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের উপায় সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত চাইতে থাকে।নবী (সাঃ) সকলের অনুশীলনকে অনুমোদন করেছেন এবং যতদূর আমি জানি, কোনো হজযাত্রীর দ্বারা বর্ণিত কোনো কাজকে প্রত্যাখ্যান করেননি।

এটি দেখায় যে এই সমস্ত হজযাত্রীরা হজের আচার-অনুষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্নভাবে পালন করেছিল। তবুও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের হজকে অনুমোদন করেছেন। তাদের কাজগুলো গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মানে হলো, একটিআমলের বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে, যদিসেইআচার বা অনুশীলনের মূলভাব বজায় রাখা হয়।একে বিচ্যুতি বলা যায় না।

আমরা জানি যে, হাদিসে তাশাহহুদ (নামাযের শেষ অংশে বসে নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করা) সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। এই বিষয়ে সমস্ত হাদিস আইনগত বিষয়ে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহান সাহাবীদের (রা.) প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এই হাদিসগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই তাশাহহুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। তবুও, সকলের সারমর্ম এবং মূলভাব একই। ধরা যাক, কেউউমর (রা.) বা ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত দোয়া গ্রহণ করে এবং আয়েশা (রা.) এর বর্ণিত দোয়া পাঠ না করে। তাহলে কি বলা সমীচীন হবে সে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে? অবশ্যই না! কেউনিঃসন্দেহে এই হাদিসগুলোর কোনোটির প্রামাণ্যতা নিয়ে তর্ক করতে পারে এবং কেউ বৈধভাবে ঘোষণা করতে পারে যে এই বর্ণনাটি ঐটির চেয়ে বেশি প্রামাণিক।তবে, কেউএই দোয়াগুলোর কোনোটিকে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি বলে ঘোষণা করতে পারে না।

আমি মনে করি, সুরা ফাতিহা পাঠ করার পর অথবা নামাযে ইমামের সুরা শেষ করার পর উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।নামাযে বুকে হাত বাঁধা বা হাত ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিও একই রকম।

আমি এগুলোকে গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না।বড়দের এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এই আমলটি ওই আমলের থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আমলের এই বৈচিত্র অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।আমাদের অধিকার নেই যে এই বৈচিত্র্যের কারণে আমরা কাউকে সুন্নাতের আমল থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে এই কথা বলতে পারি।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেন একাধিক বিবাহ বিবাহ করেছিলেন?

জাভেদ আহমেদ গামিদি

মানুষের ফিতরাতের মধ্যে পরিবার গঠনের তাগিদ বদ্ধমূল রয়েছে।একারণেই নারী ও পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরিবার গঠন করে।একজন মানুষ হিসেবে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যেও ফিতরাতের এই তাগিদ বিদ্যমান ছিল।তাঁর চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হয়ে যখন হজরত খাদিজা (রা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখনতিনি তাতে রাজি হন এবং পঁচিশ বছর বয়সে হজরত খাদিজাকে তিনি বিয়ে করেন। হজরত খাদিজা (রা.) জীবিত থাকা অবস্থায় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যকোনো নারীর সঙ্গে বিবাহের কথা মনেও আনেননি।রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বিয়ের আগে হজরত খাদিজা (রা.)-এর আরোদুটি বিয়ে হয়েছিল।তিনি ছিলেন বিধবা এবং তাঁর সন্তানও ছিল।হজরত খাদিজা (রা.) ছিলেন পবিত্র চরিত্রের অধিকারী একজন নারী। তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতার জন্য তিনি ‘তাহিরা’ (পবিত্রা) উপাধিতে অভিষিক্ত ছিলেন।

তাঁদের এই পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে ছিল প্রায় পঁচিশ বছর।হজরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাহয়েপড়েন এবং গৃহস্থালির দায়িত্বভার বহন করা তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) হজরত খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দ্বিতীয় বিয়ে করার পরামর্শ দেন। তাবাকাত ইবনে সাদে উল্লেখ করা হয়েছে, খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) বলেছিলেন: "আল্লাহর রাসুল, আমিদেখতে পাচ্ছি যে, খাদিজার সঙ্গ হারানোর পর আপনি কেমন জানি একা হয়ে পড়েছেন... আমিকি আপনার পক্ষ থেকে কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দিব না?" (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৫/৫৭)

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাওলা বিনতে হাকিম (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, তারখোঁজে কোনো উপযুক্ত পাত্রী আছে কিনা? খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) জবাবে বললেন, তারখোঁজে বিবাহ উপযুক্ত একজন কুমারী ও একজন বিধবা নারী আছেন।রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে চাইলেন, কুমারী কে? খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) উত্তরে বললেন: আপনার প্রিয়তম বন্ধু আবু বকর (রা.)এর কন্যা, আয়েশা।এরপর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে চাইলেন, বিধবা কে? উত্তরে খাওলা বিনতে হাকিম (রা.) বললেন: সাওদা বিনতে যামাআ, যিনি ইতোমধ্যে ঈমান এনেছেন।রাসুল (স.) খাওলা বিনতে হাকিম (রা.)কে বললেন: তবেতাদের সঙ্গে কথা বলো।খাওলা (রা.) যখনউভয় পরিবারের সঙ্গে কথা বললেন, তখনদুপক্ষ থেকেই সম্মতি জানানো হলো।

যেহেতু সরাসরি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাওলা (রা.)কে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাইনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। ফলে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয়কে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সাওদা বিনতে যামাআ (রা.)কে বিবাহের সাথে সাথেই ঘরে নিয়ে এলেন। মূলত সাওদা বিনতে যামাআ (রা.) ছিলেন একজন বিধবা এবং বয়সে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছাকাছি। তাই তিনি গৃহস্থালির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উপযুক্ত ছিলেন।চার বছর পর আবু বকর (রা.) রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অনুরোধ করলেন, যেনতিনি হজরত আয়েশা (রা.)কে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিন্তা করলেন যে, একজন বিধবা ও বয়স্কা নারী ঘরে থাকা অবস্থায় যদি একজন কুমারীকে আনা হয়, তাহলে এতে ঐ বিধবা নারীর অভিযোগ থাকতে পারে। তাই তিনি হজরত সাওদা (রা.)কে প্রস্তাব দিলেন যে, আপনার যদি কষ্ট হয়, তাহলে আমি আপনাকে তালাক দিতে পারি।

এ কথা শুনে হজরত সাওদা (রা.) বিনীতভাবে বললেন: “আমিএমনএক বয়সে উপনীত হয়েছি, যেখানে দাম্পত্য সম্পর্কে আর কোনো আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নেই।আমি আমার সকল অধিকার আয়েশার জন্য ছেড়ে দিতে রাজি আছি।আপনি আমাকে তালাক দিবেন না। আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, কিয়ামতের দিন আমি যেন আপনার স্ত্রীদের কাতারে দাঁড়াতে পারি।

এই আন্তরিক আবেদন শুনে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেও স্ত্রী হিসেবে রাখলেন।কিন্তু কার্যত হজরত আয়েশা (রা.) তখনরাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাম্পত্যসঙ্গিনী ছিলেন।

মানুষ মুহাম্মদ হিসেবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় মোট এই তিনটি বিয়েই করেছিলেন।

অতএব যারা তাঁকে বহু বিবাহের অযাচিত অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তাঁর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের ওপর কুৎসার ছিটে ফেলতে চায়–তাদের সম্পর্কে কেবল এ কথাই বলা যায়; তাদের হৃদয়ে আল্লাহভীতির কোনো স্থান নেই।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর কেউ তাঁর চরিত্র বা আচরণ সম্পর্কে একটিবারের জন্যও প্রশ্ন তোলার সাহস করেনি। যৌবনের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে তিনি বিবাহ করেন এক বিধবা ও সন্তানসম্পন্ন নারীকে। এমন এক আরব সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে একাধিক বিবাহ ছিল সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু প্রায় পঁচিশ বছর একজন স্ত্রীর সঙ্গেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং কখনো দ্বিতীয় বিবাহের কথা চিন্তাও করেননি। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন – এবংতাওএক পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা নারীকে। তিনি সারাযিবনে কেবল একজন কুমারী নারীকে বিবাহ করেন এবং সেই নারীকে দীর্ঘদিন পর নিজের ঘরে এনেছিলেন। কারণ বয়সে বড় যে স্ত্রীকে গৃহস্থালির দায়িত্ব পালনের জন্য ঘরে আনা হয়েছে, তিনি যেন উপেক্ষিত বা অবহেলিত বোধ না করেন।এমন এক মানুষ সম্পর্কে কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে হঠাৎ তিনি একাধিক বিবাহে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেই নিজের বানানো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একের পর এক নারীকে বিবাহ করেন – তাহলে এমন ধারণা একমাত্র বিকৃত মানসিকতার কোনো অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব।

তবে জীবনের শেষ আট বছরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরওআটজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহগুলোর জন্য বিশেষ বিধানও নাজিল হয়েছিল। এইসব বিবাহ একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি করেননি, এবং এগুলোতে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা কামনা-বাসনা ছিল না। বরং আল্লাহর শেষ রাসুল হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণই আল্লাহর নির্দেশে তিনি এইসব বিবাহ করেছিলেন। একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যদি নিজেকে অন্ধ পক্ষপাত থেকে মুক্ত রেখে এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করে, তাহলে সে এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারবে না। এখন নিচে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো:

১. বদরও উহুদের যুদ্ধের পর বহু মুসলমান শহিদ হন।তাঁদের স্ত্রী ও এতিম সন্তানদের লালন-পালন মদিনার মতো ছোট্ট রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ নির্দেশ দেন, যদিকোনো ব্যক্তি এই আশঙ্কা করেন যে, এতিমদের সম্পদ, অধিকার ও ভবিষ্যৎ রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা একা পালন করতে পারবেন না, তবেতাদের উচিত –এতিমদের মায়েদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে বৈধভাবে তাদের বিবাহ হতে পারে, তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এর মাধ্যমে ঐ নারীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় এবং তাদের সন্তানদের জন্য একটি স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

এটি এমন এক নির্দেশ, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। নিয়মানুসারে সর্বাগ্রে এই নির্দেশ পালনের দায়িত্ব আল্লাহর শেষ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরই বর্তায়।তাই তিনি তিনজন বিধবা নারীকে বিবাহ করেছিলেন।এই তিনজন মহীয়সী নারী হলেন: হাফসা বিনতে উমর (রা.), জয়নব বিনতে খুযায়মা (রা.) এবংউম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া (রা.)।

২. কুরআনে যখন দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সমাজে দাসদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য নানান দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়, তখননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং এই নির্দেশনার বাস্তব রূপ দেখানোর জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।তিনি তাঁর ফুফাতো বোন সাইয়্যিদা জয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর বিবাহ দেন তাঁরই মুক্তকৃত দাস সাহাবি ও পালকপুত্র হযরত জায়েদ (রা.)-এর সঙ্গে।এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত, যা আরবসমাজে বিদ্যমান সামাজিক বিভাজনের বিরুদ্ধে একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি।উভয়ের মধ্যে বনিবনা হয়নি এবং শেষপর্যন্ত জায়েদ (রা.) স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই বিচ্ছেদ ছিল সাইয়্যিদা জয়নব (রা.)-এর জন্য গভীর বেদনাদায়ক ও মানসিকভাবে চরম দুঃখজনক একটি ঘটনা।

একদিকে এই মহীয়সী নারী সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে একজন মুক্ত দাসকে বিবাহ করার মতো সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, যা সেইসময়কার আরব সমাজে অত্যন্ত বিরল ঘটনা ছিল।অপরদিকে তিনি তালাকপ্রাপ্তও হন, যা তাঁর জন্য ছিল এক গম্ভীর মানসিক আঘাত। তাঁকে মানসিক সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি ‘পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম’ – জাহিলি যুগের এই বদ্ধমূল বিশ্বাসকে চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ সরাসরি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নির্দেশ দেন: যেনতিনি নিজেই সাইয়্যিদা জয়নব (রা.)-কে বিবাহ করেন।এই নির্দেশ যখন দেওয়া হয়, তখননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইতোমধ্যে চারজন স্ত্রী ছিলেন।তথাপি আল্লাহর এই বিশেষ আদেশ অনুসারে তিনি সাইয়্যিদা জয়নব (রা.)কে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই বিষয়ে কেউ যেন কোনো আপত্তি না তোলে, সেজন্য সতর্কবাণী হিসাবে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন: নবীমুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন শেষ নবী। অতএব, এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার তাঁকেই সম্পন্ন করতে হবে। কারণ এমন একটি কাজ করে সমাজকে পথ দেখানোর জন্য তাঁর পরে আর কেউ নবী হিসেবে আসবে না।

সাইয়্যিদা জয়নব (রা.) এবংতাঁর প্রাক্তন স্বামী জায়েদ (রা.)-এর মধ্যকার পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়েছিল, যেখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও মনে করতেন, এ অবস্থায় তাঁকেই এগিয়ে আসা প্রয়োজন।তবে তিনি তখনো তা প্রকাশ করেননি।কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ নিজেই এই বিষয়ে নির্দেশ দেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে স্মরণ করিয়ে দেন যে, একজন রাসুল তাঁর দায়িত্ব পালনের সময় মানুষের প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার ভয় করেন না। তাঁকে কেবল আল্লাহর নির্দেশই অনুসরণ করতে হয়। ফলে এই বিবাহ কোনো মানবীয় কারণে নয়, বরংসরাসরি আল্লাহ নিজেই কুরআন মাজিদে এটির ঘোষণা দেন।

আল্লাহ বলেন:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“(ওরা এই ফিতনা তখন সৃষ্টি করেছিল), যখনআপনি ঐ লোককে বারবার বলছিলেন যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং আপনি নিজেও অনুগ্রহ করেছিলেন: “তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।” তখনআপনি নিজের অন্তরে সেই কথাটি গোপন রাখছিলেন যা আল্লাহ প্রকাশ করবেন, আর আপনি মানুষকে ভয় পাচ্ছিলেন; অথচআল্লাহ এর অধিক হকদার যে, আপনি তাকে ভয় করবেন। অতঃপর জায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন, তখনআমিতাকে আপনার সাথে বিয়ে দিলাম, যাতে মুসলমানদের জন্য তাদের পালকপুত্রদের স্ত্রীদের বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা না থাকে, যখনতাদের পালকপুত্ররা ওই স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। আর আল্লাহর আদেশ তো বাস্তবায়িত হবারই ছিল।” (সুরা আহযাব: ৩৭)

৩. কুরআনে যখন এই বিবাহের ঘোষণা দেওয়া হয়, তখনএর সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধানও আল্লাহ নাজিল করেন।এই বিধান সুরা আহযাবের আয়াত ৫০-৫২ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

এই বিধানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একদিকে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা সংক্রান্ত সেইসব সাধারণ শর্ত শিথিল করা হয়েছে, যেগুলো অন্যান্য মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।অন্যদিকে সেখানে কিছু বিশেষ বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে, যা সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এই বিশেষ বিধানে কয়েকটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথমত, সাইয়্যিদা জয়নব (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহের পরও, যদিনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইচ্ছা করেন, তবেনিম্নবর্ণিত তিনটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তিনি আরও বিবাহ করতে পারেন:

১. সেইউচ্চবংশীয় নারীদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য, যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো অভিযানের ফলে বন্দিনী হয়ে তাঁর অধীনে আসেন।

২. সেইনারীদের মানসিক সান্ত্বনা ও মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যারা নিছক রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সঙ্গী হিসেবে পেতে চায় এবং সম্পর্কের আশায় স্বেচ্ছায় নিজেকে তার কাছে অর্পণ করে।

৩. সেইসব চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ও খালাতো বোনদের হৃদয় প্রশান্ত করার উদ্দেশ্যে, যাঁরা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে হিজরত করেছেন এবং এ পথে তাদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, পরিবার-পরিজন সব কিছু ত্যাগ করে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু এই বিবাহগুলো তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য করছেন, তাইএই স্ত্রীদের প্রতি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপরআরোপিত হয় না।

তৃতীয়ত, আল্লাহ জানিয়ে দেন, এই স্ত্রীদের ব্যতীত আর কোনো নারীর সঙ্গে এখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং একবার কারো সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর তাকে তালাক দিয়ে তার স্থলে নতুন কোনো স্ত্রীও তিনি ঘরে আনতে পারবেন না।

এখান থেকে স্পষ্ট যে, কঠিন পরিস্থিতিতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ডাকে যে নারীগণ সাড়া দিয়েছিলেন কিংবা তাঁর কোনো অভিযানের ফলে চরম কষ্ট-দুঃখে পতিত হয়েছিলেন অথবা যাদের মনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, আল্লাহ চেয়েছেন, যেননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।এটি এই নারীদের প্রতি মহান আল্লাহর পরম অনুগ্রহ ও দয়া ছিল।আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ দেওয়ার কারণে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যে সায়্যিদা জুয়াইরিয়া (রা.) ও সায়্যিদা সাফিয়া (রা.)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।সায়্যিদা মায়মুনা (রা.)কে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে তিনি বিয়ে করেন এবং সায়্যিদা উম্মে হাবিবা (রা.)-এর সঙ্গে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয় উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটিছিলএকটি ধর্মীয় দায়িত্ব, যা নবুয়ত ও রিসালাতের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্ব হিসেবে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরআরোপিত হয়েছিল এবং তিনি সেই দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করেছিলেন।এর সঙ্গে মানবীয় আকাঙ্ক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই।তাই সাধারণ বিধান থেকে এটিকে পৃথক করা জরুরি ছিল।এজন্যই সুরা আহযাবে এর জন্য পৃথক বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা কি ইসলামে হারাম?

রফি মুফতি

সাধারণভাবে মুসলিমরা মনে করে প্রাণীর ছবি এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করা ইসলামে হারাম। যদিও পবিত্র কুরআনে সরাসরি প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করাকে হারাম বলা হয়নি। তবে বেশ কিছু হাদিসের মধ্যে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের মতে প্রাণীর ছবি এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম নয়।যেহেতু কুরআনে সরাসরি নিষেধ করা হয়নি, সুতরাং হাদিসের নিষেধাজ্ঞাগুলো যথার্থ মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।আজকের এই প্রবন্ধে কুরআন, সুন্নাহ এবং হাদিসের যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করব ইসলামে কেন প্রাণীর ছবি এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম নয়।

হারাম ও হালালের বিধান

পৃথিবীতে হারামের সংখ্যা খুবই সীমিত। কোনো কোনো কাজ হারাম এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত আল্লাহ কর্মগত হারাম কাজের তালিকা দিয়েছেন, দ্বিতীয়ত পানাহারের বস্তুর মধ্যে কোনগুলো হারাম তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই প্রবন্ধে আমরা কর্মগত হারাম সম্পর্কে আলোচনা করছি, তাইএখানে আমি শুধু এ সম্পর্কিত আয়াতটি উল্লেখ করছি।

এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

বলুন, আমার প্রভু শুধু এই কাজগুলোই হারাম করেছেন; প্রকাশ্য ও গোপন সবধরনের অশ্লীলতা, অধিকার হরণ, অন্যায় সীমালঙ্ঘন, আল্লাহর সাথে তোমাদের এমন কিছু শরিক করা যার ব্যাপারে তিনি কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি আর আল্লাহর নামে মিথ্যা রটিয়ে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না।(সুরা আরাফ: ৩৩)

উল্লেখ্য যে, হারামের মূলনীতি হিসেবে এই আয়াত বর্ণনা করার আগে আল্লাহ ঈমানদারদের সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেছেন,

আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহর দেওয়া ওই সাজ-সজ্জা কে হারাম করল যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পাক-পবিত্র খাবারগুলোই বা কে নিষিদ্ধ করল? বলুন, এগুলো দুনিয়ার জীবনেও (মূলত) ঈমানদারদের জন্য (যদিও তাতে অস্বীকারকারীরা ভাগ পাচ্ছে) কিন্তু কিয়ামতের দিন এগুলো তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এভাবেই আমি আমার আয়াতগুলো ওই লোকদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করি যারা জানতে চায়।((সুরা আরাফ: ৩২)

চিত্রকর্ম ও ভাস্কর্য সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য বর্ধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী জিনরা হযরত সুলাইমান (আ.)এর জন্য অনেক কিছু নির্মাণ করে দিত, তারমধ্যে ভাস্কর্যও ছিল। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। যাইহোক, সুরা আরাফের ৩৩ নম্বর আয়াতে যে কাজগুলোকে হারাম বলা হয়েছে, কোনো চিত্রকর্ম এবং ভাস্কর্য যদি সেগুলোর আওতায় পড়ে তাহলে সেটি হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্যথায় সাধারণভাবে প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা ইসলামে হারাম নয়।

কুরআনের দৃষ্টিতে প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য

কুরআনে মূর্তি বা ভাস্কর্যের বিষয়ে আমরা দুই ধরনের আয়াত দেখতে পাই। প্রথমত আল্লাহ পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তির নিন্দা করেছেন, দ্বিতীয়ত সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তি বা ভাস্কর্যের নীরব প্রশংসা করেছেন।

পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তির নিন্দা করে কুরআনে বলা হয়েছে,

যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন: এই মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর সাথে তোমরা জুড়ে রয়েছ? তারা উত্তর দিল: আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এদের উপাসনা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: বাস্তবতা হলো, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা একটি সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।(সুরা আম্বিয়া: ৫২-৫৪)

সাজ-সজ্জা বা সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত ভাস্কর্যের বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

তারা তাঁর জন্য তিনি যা চাইতেন নির্মাণ করে দিত– খিলান, ভাস্কর্য, বড় বড় হাউজের মতো থালা এবং চুলার উপরে বসে থাকা বড় বড় ডেগ, এসবকিছুই। দাউদের পরিবার, (তেমাদের প্রভুর প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যাও। বাস্তবতা হলো, আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই কৃতজ্ঞ হয়।(সুরা সাবা: ১৩)

উল্লেখ্য যে, সুরা আম্বিয়া এবং সাবার উভয় আয়াতেই মূর্তি বা ভাস্কর্য বোঝাতে কুরআনে “تماثيل” (তামাসীল) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘তামাসীল’ শব্দটি ‘তামসীল’-এর বহুবচন। লিসানুল আরাব গ্রন্থে ‘তামসীল’ শব্দের অর্থ করা হয়েছে: এমনপ্রতিটি কৃত্রিম বস্তু যা আল্লাহর সৃষ্ট কোনো কিছুর সদৃশ করে বানানো হয়, তা জীবন্ত হোক বা জড়। কাশশাফ গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম জমাখশারি (রহ.) এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তামসীল হলো প্রতিটি মূর্তি বা চিত্র যা অন্য কোনো বস্তুর অবয়ব অনুসরণ করে বানানো হয়, তা প্রাণী হোক বা জড়। কুরআনের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, চিত্র অংকন, মূর্তি বা ভাস্কর্য কুরআনে এজন্য হারাম করা হয়েছে; কারণ এগুলো পূজার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। এছাড়া ইসলামে প্রাণীর ছবি ও মূর্তি নির্মাণ করা হারাম নয়।

হাদিসের দৃষ্টিতে প্রাণীর ছবি ও ভাস্কর্য

আমাদেরকে কুরআনের আলোকে হাদিস বুঝতে হবে। কারণ হাদিস কখনোই স্বতন্ত্রভাবে শরিয়তের বিধান জারি করতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যে বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে, হাদিস মূলত সেই বিধানগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে। সুতরাং প্রাণীর ছবি বা মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে হাদিসের মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা মূলত কুরআনে বর্ণিত হারামের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কুরআনে যেভাবে পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তির নিন্দা করা হয়েছে এবং সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে নির্মিত মূর্তির নীরব প্রশংসা করা হয়েছে; একইভাবে হাদিসের মধ্যে ঐসকল মূর্তি বা ছবির নিন্দা করা হয়েছে যা পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় এবং কুরআনে বর্ণিত হারামের মূলনীতির আওতার মধ্যে পড়ে। চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য নির্মাণের বিষয়ে যতগুলো হাদিস রয়েছে সেগুলোকে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. চিত্র অঙ্কনকারীদের প্রতি অভিশাপ

কিছু হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, রাসুল (স.) চিত্র অঙ্কনকারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। এইগুলো যথাক্রমে সহিহ বুখারি: ২০৮৬, ৫৯৫১, ৫৯৬৩ এবং সহিহ মুসলিম ২১০৭ নাম্বার হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।রাসুল (স.) বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে পড়বে চিত্রশিল্পীরা।

আমরা যদি এই হাদিসগুলোকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নিয়ে সব ধরনের চিত্রশিল্পীদের অভিশপ্ত মনে করি; তাহলে এটি পবিত্র কুরআন এবং বেশ কিছু সহিহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।কারণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি কুরআনে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা হারাম করা হয়নি।একইভাবে বেশ কিছু হাদিসের মধ্যে আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব, পর্দা বা কাপড়ের উপর অঙ্কিত ছবি রাসুল (স.) হারাম করেননি।সুতরাং স্পষ্টভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, চিত্রশিল্পীদের অভিশাপ দেওয়ার বিষয়টি সুরা আরাফের ৩৩ নম্বর আয়াতে হারামের যে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ অশ্লীল বা মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে কেউ যদি কোনো ছবি আঁকে তাহলে সেটি অবশ্যই ইসলামে নিষিদ্ধ এবং এই ছবি অঙ্কনকারী ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই অভিশপ্ত।

২. কাপড়ে বা অবমাননার স্থানে কোনো ছবি থাকলে সেগুলো নিষেধ নয়

আবু তালহা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স.) বলেছেন, যে ঘরেকোনো ছবি থাকে, সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। বুসর (রহ) বলেন, পরেএকবার জায়েদ ইবনে খালিদ (রা.) অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম, তাঁর ঘরে একটি পর্দা টাঙানো আছে, যাতে নকশা করা ছবি রয়েছে। আমি উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি আমাদেরকে ছবির হারাম হওয়া সম্পর্কে বলেননি? উবাইদুল্লাহ উত্তর দিলেন, তিনি তো এও বলেছিলেন যে, যদিতা কাপড়ের উপর নকশা আকারে হয় তাহলে ব্যতিক্রম হতে পারে। তুমি কি এটি শোনোনি? আমিবললাম, না। তিনি বললেন, অবশ্যই তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন। (সহিহ বুখারি: ৩২২৬)

আবু হুরায়রা (রা.) নবী (স.) থেকে মারফুভাবে বর্ণনা করেন, যেসব ছবি অপমানিত অবস্থায় পদদলিত হয় (যেমন কার্পেট, বালিশের নকশা ইত্যাদি), সেগুলোর ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু যেসব ছবি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, সেগুলো নাজায়েজ। ((আদ-দিরায়াহ ফি তাখরীজি আহাদিস আল-হিদায়া: ২৩৮)

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার একটি পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ছবি আঁকা ছিল। নবী (স.) এটিদেখে ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর আয়িশা (রা.) ঐ কাপড় দিয়ে দুটি বালিশ বানালেন। সেই বালিশ দুটি ঘরেই রাখা হত এবং নবী (স.) সেগুলোর উপর বসতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস নং ২৪৭৯)

এসকল হাদিস থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি ইসলামে ঢালাওভাবে সব ধরনের ছবি হারাম নয়। যদি তাই হত তাহলে রাসুল (স.) এই ছবিগুলোর ক্ষেত্রে অনুমতি দিতেন না। সুতরাং হারামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক ছবিকেই হাদিসে রাসুল (স.) নিষেধ করেছেন।

৩. শির্কের সাথে সম্পৃক্ত ছবিকে রাসুল (স) হারাম করেছেন

আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) তাঁর ঘরে ক্রুশের নকশাযুক্ত কোনো বস্তু দেখলে তা অবশ্যই ভেঙে দিতেন।(সহিহ বুখারি: ৫৯৫২)

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, উম্মে হাবিবা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.) রাসুল (স.)কে হাবশায় দেখা একটি গির্জার কথা বললেন, যেখানে ছবি ছিল। তখন রাসুল (স.) বললেন, এরা (খ্রিস্টানরা) যখনকোনো নেক ব্যক্তিকে পেত, সে মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নিত এবং সেখানে এসব ছবি আঁকত।কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হবে।(সহিহ মুসলিম: ৫২৮)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) যখন (মক্কা বিজয়ের সময়) কাবাঘরে ছবি দেখলেন, তখনতিনি সেখানে প্রবেশ করলেন না, যতক্ষণ না সেগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন।অতঃপর সেগুলো মুছে ফেলা হলে তিনি প্রবেশ করলেন। (সহিহ বুখারি: ৩৩৫২)

সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন যখন কিছুটা শান্ত হলেন, তখনতিনি একটি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে নিজ হাতে থাকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন।অতঃপর তিনি কাবাঘরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে কাঠের তৈরি একটি কবুতর (মূর্তি) দেখতে পেয়ে তা ভেঙে ফেললেন। এরপর তিনি কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে সেটি বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।আমি তখন তাঁর এই সমস্ত কাজ নিজ চোখে দেখছিলাম।(ইবনে মাজাহ: ২৯৪৭)

ক্রুশের নকশা ভেঙে দেওয়া, গির্জার দেয়ালে অঙ্কন করা ছবির নিন্দা করা এবং কাবাঘর থেকে মূর্তি নিধন করা; এসকল হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, ছবিঅথবা মূর্তি ইসলামে ঢালাওভাবে নিষিদ্ধ নয়।বরং যেসকল ছবি বা মূর্তি শিরকের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামে সেগুলোকেই হারাম করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা

আবু যুরআ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিআবুহুরায়রা (রা)-এর সাথে মারওয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। সেখানে তিনি কিছু ছবি দেখে বললেন, আমিরাসুল (স)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা বলেন, সেইব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে, যে আমার সৃষ্টির অনুকরণে সৃষ্টি করতে বের হয়? একটি কণাও সৃষ্টি করে দেখাক, অথবা একটি দানা কিংবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করে দেখাক! (সহিহ মুসলিম: ২১১১)

এখানে সাধারণ মূর্তি বা ছবি নির্মাণ করার কথা বলা হয়নি। মূলত আরব মুশরিকদের ধারণা ছিল তারা যে মূর্তিগুলো নির্মাণ করে তা নির্জীব নয়।এগুলো পাথর বা কাঠ দিয়ে তৈরি হলেও এগুলোর মধ্যে প্রাণ রয়েছে। এ কারণেই হাদিসে তাদের এই ধারণাকে নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, يخلق خلقا كخلقى" (আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করে)।বস্তুত এটি একটি শিরকি আকিদা, যা তৎকালীন আরবের মুশরিকরা পোষণ করত।এ কারণেই উক্ত হাদিসে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

৫. কিছু হাদিসে সরাসরি প্রাণীর ছবি নিষেধ করা হয়নি তবে রাসুল (স.) ব্যক্তিগতভাবে সেগুলোকে পছন্দ করেননি। নিচে এ ধরনের কিছু হাদিস তুলে ধরা হলো:

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল, যাতে একটি পাখির ছবি আঁকা ছিল।বাড়িতে কেউ প্রবেশ করলে তার সামনে সেই ছবিটি দেখা যেত। রাসুল (স.) আমাকে বললেন, এটিসরিয়ে দাও। কারণ আমি যখনই ঘরে প্রবেশ করি এবং এটি দেখি, তখনএটিআমাকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।(সহিহ মুসলিম: ২১০৭)

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) ফাতিমা (রা.)-এর ঘরের দরজায় এসেছিলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করে ফিরে গেলেন। পরে আলী (রা.) এসেফাতিমা (রা.)-কে এই ঘটনা জানালে তিনি নবী (স.)কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললেন। আলী (রা.) নবী (স.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ফাতিমার ঘরে প্রবেশ করলেন না কেন? নবী (স.) উত্তর দিলেন, আমিতারদরজায় নকশাকৃত একটি পর্দা দেখেছি। এরপর তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-কে এই কথাজানালে তিনি বললেন, নবী (স.) এ বিষয়ে যা নির্দেশ দেন, আমিতা মেনে নেব। তখন নবী (স.) বললেন, এটিঅমুক পরিবারকে দিয়ে দাও, তাদের এটি প্রয়োজন।(সহিহ বুখারি: ২৬১৩)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল যাতে একটি পাখির ছবি আঁকা ছিল। ঘরে প্রবেশকারী যে কেউ প্রবেশ করলে তা তার দৃষ্টিগোচর হত। রাসুল (স.) আমাকে বললেন, এটিসরিয়ে দাও। কারণ আমি যখনই ঘরে প্রবেশ করে এটি দেখি, আমার মন দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে রাসুল (স.) আমাদের এটি ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেননি।(সহিহ মুসলিম: ২১০৭)

এখানে স্পষ্ট যে, রাসুল (স) ছবি অঙ্কন করাকে নিষেধ করেননি। কিন্তু তিনি তার ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে তার চোখের সামনে থেকে ছবিগুলোকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং কারণটিও তিনি উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক তৈরি হওয়ার আশঙ্কায় তিনি এই ছবিগুলোকে নিজের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এছাড়াও কয়েকটি হাদিস রয়েছে যেখানে ছবি এবং কুকুরের বিষয়ে বলা হয়েছে, ফেরেশতারা ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে। এই হাদিসগুলো সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই ইসলামের দৃষ্টিতে কুকুর পালন শিরোনামের প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকরা চাইলেই আমাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

কিছু প্রশ্নের উত্তর

প্রাণীর ছবি অথবা ভাস্কর্য হারাম হওয়ার পক্ষে আমাদের আলেমরা বেশ কিছু যুক্তি প্রদান করে থাকেন। প্রথমত তারা বলেন পৃথিবীতে মূর্তির মাধ্যমেই শিরকের প্রচলন ঘটেছে। তাই সব ধরনের মূর্তি ইসলামে হারাম। কিন্তু বাস্তবতা হলো মূর্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে শিরক শুরু হয়নি।শিরক মূলত একটি আকিদা বা চিন্তাগত বিষয়।মূর্তি পূজা ছাড়াও কেউ অদৃশ্য কোনো সত্তাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে শিরকে লিপ্ত হতে পারে। তাই এই যুক্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, মূর্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে শিরকের প্রচলন ঘটেছে।

দ্বিতীয় যে যুক্তি প্রদান করা হয় তা হলো প্রাণীর ছবি বা মূর্তি নির্মাণ করা মূলত আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ করার শামিল। আর এ ধরনের কাজ ইসলামে হারাম। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণ করা ইসলামে হারাম নয়। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, তৎকালীন আরবের লোকেরা মনে করত, তারা যে পাথর বা কাঠ দিয়ে মূর্তিগুলো তৈরি করছে তা প্রাণহীন নয়। তারা অদৃশ্যভাবে এই মূর্তিগুলোর মধ্যে প্রাণ আছে বলে মনে করত।আর এভাবেই তারা একটি মূর্তিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে উপাসনা করত।যেহেতু এটি একটি প্রকাশ্য শিরক ছিল তাই তাদের এ ধরনের কাজকে নিন্দা করা হয়েছে।মূলত পৃথিবীতে মানুষ যা কিছুই তৈরি করে তা কম বেশি আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণেই তৈরি করে। মানুষ আকাশে পাখি উড়তে দেখে প্লেন তৈরি করেছে। পানির গভীরে মাছের চলাচল দেখে সাবমেরিন তৈরি করেছে। ঠিক তেমনিভাবে মানুষ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্য নির্মাণ করে।আর অবশ্যই এ ধরনের কাজ ইসলামে নিষেধ নয়, যা ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি। আল্লাহর সৃষ্টির অনুকরণই যদি হারাম হত তাহলে গাছপালা, মাটি, পাথর, নদীনালা, গ্রহ ও নক্ষত্রের ছবি অঙ্কনও তো হারাম হওয়ার কথা।কারণ এগুলোও তো সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি।

তৃতীয় যে যুক্তিটি দেওয়া হয় তা হলো কুরআনের মধ্যে আল্লাহ হযরত সুলাইমান (আ)-এর দরবারে থাকা যে ভাস্কর্যের নীরব প্রশংসা করেছেন তা হযরত সুলাইমান (আ)-এর যুগের শরিয়তের বিধান ছিল, মুহাম্মদ (স)-এর যুগের নয়। তাদের এ যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কোনো কিছু যদি পূর্ববর্তী নবীদের যুগে কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জন্যও তা কল্যাণকর হবে।আর যদি কোনো কিছু পূর্ববর্তী নবীদের যুগে অকল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে সেটি আমাদের জন্যও অকল্যাণকর।তাই এ যুক্তি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় যে, সুলাইমান (আ)-এর যুগে আল্লাহ ভাস্কর্যের প্রশংসা করলেও মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে ইসলামে ভাস্কর্য নিষিদ্ধ। কারণ ইতোমধ্যেই আমরা কুরআনের দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে দেখেছি হারামের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হলে কোনো প্রাণীর ছবি অথবা ভাস্কর্য ইসলামে হারাম নয়।

গজল

জাভেদ আহমেদ গামিদি

یہمرا سرودکیا ہے؟ تری یاد کا بہانہ
کبھیعلم کی حکایت،کبھیعشق کا فسانہ

ইয়ে মেরা সরোদ কিয়া হ্যায়? তেরি ইয়াদ কা বাহানা
কভিইলমকি হিকায়াত, কভিইশককা ফসানা

আমার এই সঙ্গীত কী?
তোমার স্মরণেরই অজুহাত;
কখনো জ্ঞানের কাহিনী, কখনো বা প্রেমের উপাখ্যান।

وہخیالمیں بھیِ آئے تو ہجومعاشقاںتھا
نہ ہوئیوہاںبھی اُن سے رہ و رسم محرمانہ

ওহ খেয়াল মেঁভি আয়ে তো হুজুমে আশিকাঁ থা
না হুয়ী ওহাঁ ভি উনসে রাহ-ও-রসমে মহরামানা

সে কল্পনায় এলো, তখনো ছিল প্রেমিকদের ভিড়;
তাইহয়নি সেখানে কোনো প্রণয়ের ঘনিষ্ঠতা।

গজল

تریہر ادا سلامت،یہ ذرا سی بات کہہ دوں
کبھیچاہیےجنوںکو بھی خرد کا تازیانہ

তেরি হারআদা সালামত, ইয়ে জরা সি বাত কহ দুঁ
কভিচাহিয়ে জুনুঁ কো ভি খিরদ কা তাজিয়ানা

তোমার প্রতিটি ভঙ্গি সালামত থাকুক, শুধু এটুকুই বলি;
কখনো কখনো উন্মাদনারও প্রয়োজন হয় জ্ঞানের চাবুক।

ترےعہد نو کی دانشنئے بت تراشلائی
مرا لا الٰہاالّاوہی یکتاو یگانہ

তেরে আহদে নও কি দানিশ, নয়ে বুত তারাশ লাই
মেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওহিইয়াকতা ওয়া ইয়াগানা

তোমার নতুন যুগের জ্ঞান নতুন মূর্তি গড়েছে;
আমার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সেইএককও অদ্বিতীয়ই রয়ে গেছে।

یہجہاںبھی کیا جہاںہے ، اِسےجس نظر سے دیکھیں
وہی مہر و ماہ و انجم،وہی گردشزمانہ
উচ্চারণ:

ইয়ে জাহাঁ ভি কিয়া জাহাঁ হ্যায়, ইসেজিসনজরসে দেখেঁ
ওহিমেহর-ও-মাহ-ও-আনজুম, ওহিগারদিশে জামানা

এই জগৎও আসলে কী জগৎ, যে চোখেই দেখি না কেন;
সেইএকইসূর্য, চাঁদ ও তারা, সেইএকইকালের আবর্তন।

تووطن کا پاسباںہے ، مجھےکیا گلہ ہو تجھ سے
ترے ہر نفس سے لرزاںمری شاخ آشیانہ

তু ওয়াতান কা পাসবাঁ হ্যায়, মুঝে কিয়া গিলা হো তুঝসে
তেরে হার নফস সে লারযাঁ মেরি শাখে আশিয়ানা

তুমি তো দেশের রক্ষক, তোমার কাছে আমার কী-ই বা অভিযোগ?
তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমার নীড়ের ডাল কেঁপে ওঠে।

مرےہر سفر کی غایتوہی سرزمینیثرب
وہ ادب گہ محبت،وہ دلوںکا آستانہ

মেরে হারসাফর কি গায়াত, ওহিসারজামিনে ইয়াসরিব
ওহ আদবগাহে মুহাব্বত, ওহ দিলোঁ কা আস্তানা

আমার প্রতিটি যাত্রার গন্তব্য সেই ইয়াসরিবের ভূমি;
তা ভালোবাসার দরবার, হৃদয়ের আশ্রয়স্থল।